"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৫ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রণ : জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০ / অন্তর্জালে প্রকাশ : এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৫৭ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৮ই পৌষ, ১৪৩১ / 24.12.2024

-: সম্পাদক :-

সু ন ন্দ ন ঘো ষ

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
মহাভারতের উপাখ্যান	ভস্মলোচন
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিঃ	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ
স্মৃতির সরণী বেয়ে-ভাইজাগ	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
এ' যুগের ছত্রপতি	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158 / 60, published in print format for sixty years, then converted to e-magazine in April, 2020 by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher, during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720.

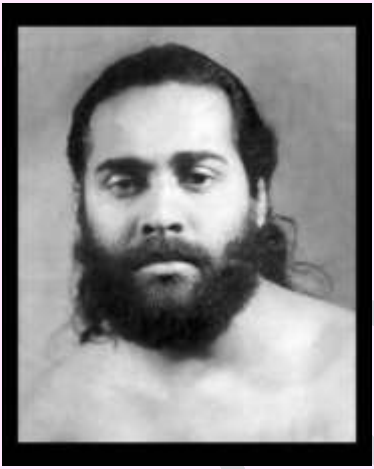

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

- প্রীতি কণা –

“অহং ভাব সকল বন্ধনের মূল। স্বার্থের বশে কর্ম না করে কোনরূপ অহংচিন্তা না রেখে ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করলে আমরা এই বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হতে পারি।”

DO NOT COPY

স্মৃতিচারণ **শুক্লা ঘোষ**

শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মদিনের ফাল্গুন সংখ্যা প্রকাশিত হল। বইটি বেশ গোছানো ও সাজানো হয়েছে। শুধু ফটোটি আমার পছন্দ হয়নি। শ্রীপ্রীতিকুমারের অমন রুগ্ন চেহারা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। অবশ্য বর্তমান ব্যয়ভারের কথা চিন্তা করে নতুন ব্লক তৈরি করাতে বোধহয় সম্পাদক মশাই আর ভরসা করেননি।

আমাদের দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। নতুন বাজেট প্রকাশিত হল। দেখলাম দুটি উল্লেখযোগ্য খবর। একটি সোনা আমদানী করা, অন্যটি নিউজপ্রিন্টের মূল্য হ্রাস। প্রেসের কর্তৃপক্ষের বিবেচনার দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছি। দাম তো একবার বৃদ্ধি হলে আর কমানো যায় না, কারণ রেলের মাশুল বৃদ্ধি, যেটা আবার আমাদের সাধারণ জীবনে অনেক ব্যয়ের বোঝা বহন করাবে।

আমাদের কেসগুলি প্রায় মিটে এসেছে। এখন আমরা হাইকোর্ট চত্বরে অপেক্ষা করছি। আমার দশদিন থেকে পালন করা সেই মেয়েটির আমাদের কাছে ফিরে আসবার আদেশ হয়েছে আলীপুর কোর্টে। তাতে অবশ্য আমি নতুন করে উদগ্রীব হয়ে উঠছি না, কারণ বিশেষ স্বার্থচক্র যাদের সহায়তা করে তারা সমাজে অন্যায় করলেও রক্ষা পেয়ে যায়।

গত ৬ বছর ধরে আমরা পথে ঘাটে, কর্মক্ষেত্রে কি অপমান, বিরূপ সমালোচনা সহ্য করেছি তা বলবার নয়। শ্রীপ্রীতিকুমারকেও আঘাত করা হয়েছে। বুকের মাস্‌ল থেঁতলে গেছিলো। সেই অপমানে, অভিমানে তিনি সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ শূন্যতা আমাদের কাছে অপূরণীয়। একটা কথা মানতে হবে – শ্রীপ্রীতিকুমারের জীবদ্দশায় তাঁর পৌত্র, পৌত্রী এ বাড়িতেই ছিল। তাঁর প্রয়াণের পাঁচ দিনের মধ্যে বাচ্চা দুটিকে তাদের মা এসে কোর্ট অর্ডার দেখিয়ে নিয়ে গেল। বাচ্চা দুটি কিছুতেই মায়ের কোলে যেতে চায় নি। কিন্তু আর আমরা তাদের এ বাড়ীতে ফিরিয়ে আনতে পারিনি। দেখা করবার রাস্তাও বন্ধ। এইবার ঠিক করেছি

আর নয়। সব অপমানের একটা শেষ আছে। পুত্তরকে বিয়ে দেবার জন্য সকলে অনুরোধ করছেন। এবার বোধহয় একমাত্র সন্তানের মঙ্গল কামনায় আমাদের সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

সবাই বলেন, "একটা ভালো মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দিন।" আমার ভালো মেয়ে নির্ণয় করবার ক্ষমতা নেই। তাছাড়া বিয়ের আগে তো সব মেয়েই ভালো থাকে। চৌকাঠ ডিঙোলে অন্য স্বরূপ দেখা দেয়। তার উপর যদি গতবারের মতো প্রতিদিন বাবা-মা-ভাই পাত্রীর শ্বশুরবাড়িতে আসে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই শান্তি বিঘ্নিত হবে। মেয়ের মন বসবে কি করে শ্বশুরবাড়িতে? আজকাল তো আগের মতো চালচলন নেই। এখন শাশুড়িরা উঠে কাজ করে, বৌরা আটটায় ঘুম থেকে ওঠে। ছেলেরা শান্তি বিঘ্নিত হবার ভয়ে স্ত্রীকে কিছু বলে না। আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দেখি তো! আজকাল ছেলেরা কত নিরুপায়!

আমার একটুও আর সংসার করবার ইচ্ছে নেই। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। আগেরবার দেখেছি তো – রান্না করা, পুত্রবধূর বাসী কাপড় কাচা, কাঁথা সেলাই, সারারাত জেগে বাচ্চাকে শান্ত করা, কি না করেছি সংসারকে ভালোবেসে? কিন্তু ভাগ্যে জুটেছে অপমান, গণপ্রহার। আর সে সুযোগ দেব না কাউকে। একটা কথা তো সত্য। মেয়েরা স্বামীর উপস্থিতিতে আত্মীয়স্বজন সন্তান সবার কাছ থেকে আঘাত সহ্য করতে পারে। কিন্তু স্বামীর অবর্তমানে খুব touchy হয়ে যায়। সামান্যতম কথাও ভীষণভাবে আঘাত করে। তাছাড়া গত ছ' বছরে আমি একটা প্রচণ্ড ঝড়ের গতিকে আটকেছি। আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি যতক্ষণ থাকবো আমার পুত্র স্বাবলম্বী হবে না। আমি চাই সে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী নিজের সংসার সামলাক। সত্যি তো! এতো কাগজে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখি। সকলে ছোট সংসার চায়। এখনকার দিনে মা, বাবা, ভাই, বোন সব Extra Player. দু'হাতে পয়সা খরচ করলে সবাই আছে পাশে। গত সাড়ে পাঁচ ছয় বছরে আমরা স্টীলের মতো মজবুত হয়ে গেছি। আর ভয় পাই না কারো কথাকে। দৈব বলে

একটা শব্দের প্রতি আমার আস্থা জন্মেছে। দোষ আমি নিজের ঘাড়ে নিতে রাজী আছি। কিন্তু আজকালকার মেয়েদের শাড়ীর সাথে ব্লাউজ ম্যাচ করে পরে, Nail Polish ও বাহারে কাঁচের চুড়ি পরে মুখে মধুর হাসি নিয়ে আত্মীয়স্বজনের সামনে চলাফেরা করাকে আমার বড় ভয়। কেউ তো কিছু জিজ্ঞেস করতে আসবে না। দূর থেকে বলবে, বাঃ! কি মিষ্টি হাসি ছিল, মুখে কথা ছিল না।” অগত্যা শাশুড়ি দোষী। কারণ শ্বশুর তো গুরুস্থানীয়। অসম্ভব দৈবী শক্তির অধিকারী, তাঁকে তো নিন্দে করা যায় না। আমি স্পষ্ট কথা বলি, ভাঙ্গি তবু মচকাই না, আমার সমালোচনা করাই সোজা। সেটা আমার সহ্য হয়ে গেছে। নিজে চাকরী করছি দীর্ঘকাল। আরও ছ’ বছর চাকরী করবো। তার মধ্যে ভবিষ্যতের একটা সুরাহা হয়ে যাবেই। তাছাড়া শ্রীপ্রীতিকুমারের সন্তান। একটা সীমার নীচে সে নামতে পারে না, এটা তিনি বারবার আমাকে বলে গেছেন। সে ভরসা তো আমার আছেই।

আমাদের দিনগুলি বদলে যাবে। আবার আমরা বিপদগুলি কাটিয়ে উঠবো। কিন্তু আমাদের জীবনে যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা অপূরণীয়। যে ঐশ্বরিক সত্তা কত শত লোককে তাদের বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে গেছেন তারা অনেকেই আমাদের চৌহদ্দীতে নেই। কিন্তু নীরেনদা, শ্রীলা, কিশোর যে অক্লান্ত সৈনিকের মতো আমাদের সঙ্গে সমরাঙ্গনে সহায়তা করেছেন, তার ঋণ আমি সারা জীবনেও শোধ করতে পারবো না। ঈশ্বরের কাছে তাদের সুখ শান্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করব প্রতিনিয়ত।

আমাদের সন্তান, যে শ্রীপ্রীতিকুমারের নয়নের মণি, যার সাথে কখনও “তুমি” ছেড়ে “তুই” বলেন নি, সেও জীবনে শান্তি ফিরে পাক, সৎ পথে থাক, এই আশীর্বাদই করি। আমি তাকে বলেছিলাম, “তোমার বাবা সাধক হওয়াতে আমার অনেক কষ্ট, দুঃখ, দৈন্য সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু আজ আর আমার দুঃখ নেই। আমি আশীর্বাদ করি তুমি খুব বড় সাধক হও।” আমি জানি আমার সে প্রার্থনা শ্রীপ্রীতিকুমার পূর্ণ করে দেবেন।

DO NOT COPY

সব শেষে একজনের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না। তিনি স্বামী বিবিদিষানন্দজী। যিনি একদিন শ্রীপ্রীতিকুমারের হাত ধরে ধর্মের পথে আকৃষ্ট হয়েছিলেন আজ ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি আমাকে যে সহায়তা করছেন তা অনস্বীকার্য। সবচেয়ে বড় কথা হল আমাদের সন্তানের মঙ্গলের জন্য তিনি আমাকে যে নির্দেশ দেন, আমি তা পালন করবার চেষ্টা করি। আমার দৃঢ় ধারণা তিনি নিজে যোগশক্তির দ্বারা সম্ভাবনাটা আঁচ করতে পারেন। এ পরিবেশে আমি সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে অভ্যস্ত । আমার পুত্র তার পিতার প্রভাবে প্রভাবিত। তাই আমি বিশ্বাস করি সে তার পিতার কাছ থেকে পথনির্দেশ পাবেই। মুখে যাই বলিনা কেন, মনে মনে আমি জানি, শ্রীপ্রীতিকুমারের বলে যাওয়া কথাগুলি একদিন এ’ সংসারে ঘটবেই।

অবশেষে আমার একটি আবেদন আছে। আমার নিজের পূজা অর্চনা আছে, চাকরী আছে। সংসারের সব কাজ আমাকে একা করতে হয়। আপনারা শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রতি ভক্তিবশতঃ বা আমার প্রতি প্রেমবশতঃ হঠাৎ হঠাৎ সকালবেলায় হানা দেবেন না। দয়া করে একটু বাস্তববাদী হন। সকালবেলাটা লোকের গল্প করবার সময় নয়। তাছাড়া বাপীরও অফিস আছে। এ’রকম দু’চারদিন হয়েছে তার লেট হয়ে গেছে। হয়ত ভদ্রতা করে কিছু বলেনি। কিন্তু আমরা যারা চাকুরীজীবি, আমাদের অনেক তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয়।

আরেকটি অনুরোধ। যেদিন যার এখানে আসবার কথা, সেদিন দয়া করে আসবেন, না আসলে জানিয়ে দেবেন। আমি তিনটে বাস বদল করে, ছুটতে ছুটতে আসি। অনেক সময় বেলুড় বা দক্ষিণেশ্বরেও যাই না তাঁরা আসবেন বলে। কিন্তু বাড়ি এসে যখন দেখি তারা আসেননি, স্বাভাবিকভাবেই বিরক্তি আসে। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে একটু সতর্ক হবেন আশা রাখছি।

অনেকে আছেন, অনেক ঘটনা আমাদের কাছে গোপন করে যান। বিপদে পড়লে আবার সব কিছু ব্যক্ত করতে ছুটে আসেন। যে অন্যায় তারা আমাদের

DO NOT COPY

জানিয়ে করেন নি, সেই অন্যায়ের সামাল দেবো কেনো? অন্যের দ্বিমুখী নীতিতে আমাদের সোজা পথে চলতে অসুবিধে হয়।

শ্রীপ্রীতিকুমার ভিক্ষা করেও পার্থসারথি চালাবেন বলেছিলেন। আমি শ্রীপ্রীতিকুমার নই। ছোটবেলায় পড়া কবিতার লাইনটাই বলি।

"যে রাজার দ্বারে ভিক্ষুক রাজা
মাগিব তাঁহারি কাছে।"

অগত্যা আপনারা বুঝে নেবেন ......

পরের সংখ্যায় শ্রীপ্রীতিকুমারের জন্মোৎসবের বর্ণনা দেব।

- - - - - - - - -

(** রচনাকাল – মার্চ, ১৯৯২)

"সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, সবই খেলা, দুদিনের। কিছুতেই ব্যাথিত হবার কিছুই কারণ নেই। নদী বেয়ে যে শব ভেসে যাচ্ছে কে জানে হয়তো দূর কোন অজানা নক্ষত্রে অর মৃত্যু নবজীবন লাভ করেছে। অর মৃত্যু-যন্ত্রণা সার্থক হয়েছে। এই বিচিত্র বিশ্বলীলার সকলেই যে যাত্রী!"

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

DO NOT COPY

সচ্চরিত্রত্ব –দুর্যোধন-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ

[Morality is Religion in Practice, Religion is Morality in Principle -- Word Law]

(১)

মুণ্ডকোপনিষদের ‘ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ’ শ্লোকটির প্রতিধ্বনি করেই, শ্রীরামকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করতে শোনা যায় স্বামী বিবেকানন্দকে ‘নির্ভর, গতসংশয়, দৃঢ়নিশ্চয় - মানসবান’ বলে। বস্তুতঃ এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় মানসতা যে কত দুর্লভ এবং ওর অভাবে সকল ধর্মকর্মই কেমন করে বিফলতায় পর্যবসিত হয়, তার একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত মহাভারতের কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রটি। অনেক সদ্‌গুণেরই অধিকারী ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। স্থান বিশেষে অনেকানেক ধর্ম বা নীতি-কথাও উচ্চারিত হতে শোনা যায় তাঁর মুখ দিয়ে। কিন্তু দেখা যায় - দুর্যোধনাদি পুত্রদের কিছুমাত্র অমঙ্গলের আশঙ্কা - কোন কারণে তাদের একটু রুষ্ট দেখলেই, জন্মান্ধ রাজা পুত্রস্নেহে যেন আরও বেশী অন্ধ হয়ে উঠে, এককালে সকল ধর্মজ্ঞান-নীতিজ্ঞানই হারিয়ে ফেলতেন।

(২)

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে নিজচোখে পাণ্ডবদের অগাধ ঐশ্বর্যের প্রমাণ পেয়ে, নিতান্তই ব্যথিত হয়ে পড়েছিলেন দুর্যোধন। তার উপর ‘কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে’ পড়েছিল, যখন সভাগৃহে কখনও স্ফটিককে জল, আবার কখনও জলকেই স্ফটিক ভেবে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ায় এক যুধিষ্ঠির ছাড়া বাকী পাণ্ডবদের, এমনকি তাঁদের চাকর বাকরদের কাছে পর্যন্ত তাঁকে হাস্যাস্পদ হতে হয়েছিল! কাজেই হস্তিনায় ফিরে এসে দুঃখে ক্ষোভে অপমানে একরকম অনাহার-অনিদ্রায়ই দিন কাটতে থাকে মহামানী দুর্যোধনের। অবশেষে সুযোগমত জানালেন একদিন তিনি অন্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর দুঃখের কাহিনী। কিন্তু দেখা যায়, প্রথম ধাক্কাতেই পেরে উঠলেন না তিনি বৃদ্ধ রাজার নীতিজ্ঞানকে ধূলিসাৎ করে ফেলতে। বরং তাঁর মুখে সব কথা

DO NOT COPY

শুনে বলতে শোনা যায় ধৃতরাষ্ট্রকে - 'বৎস! তোমার সন্তাপের তো বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। তুমি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ। তোমার ভ্রাতৃগণ ও বন্ধু বান্ধবেরা কিঙ্করের ন্যায় সতত তোমার আজ্ঞানুবর্তী রহিয়াছে।তুমি অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান ও উপাদেয় পলান্ন ভোজন করিয়া থাক এবং সুদৃশ্য অশ্ব সমুদয় তোমাকে বহন করে। তবে তুমি কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া গিয়াছ?' [ধৃতরাষ্ট্র দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলেন, কাজেই ধরে নিতে হয়, লোকমুখেই তিনি দুর্যোধনের শারীরিক অবস্থার কথা জানতে পেরেছিলেন]। সে যাই হোক, প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত নাগমশাইয়ের একটা কথা - 'বনের সাপে খায় নারে! মনের সাপেই খায়!' রামভক্ত তুলসীদাসকেও অনুরূপভাবে বলতে শোনা যায় –'চিন্তাসাঁপিন কো নাহিঁ খায়া' - এজগতে এমন কে আছে যাকে চিন্তাসাপিনী দংশন না করেছে? কাজেই বলতে হয় – এদের মনের সাপ বা 'চিন্তাসাপিনী' যাকে অহরহ-ই দংশন করে চলেছে, রাজবেশ পরে বা রাজভোগ খেয়েও, সে যে দিন দিনই 'পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ' হতে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কী? যাহোক ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে, মনের কথা মুখে এনে বললেন এবারে দুর্যোধন, "মহারাজ! পাণ্ডবদিগের আলয়ে প্রতিদিন দশ সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ সুবর্ণ পাত্রে আহার করে। আর তাহাদিগের ফলপুষ্পোশোভিত দিব্যসভা, তিত্তিরি ও কল্মষদেশীয় অশ্ব এবং বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র আছে। [বলাবাহুল্য, রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষ্যে দেশ বিদেশের রাজাদের কাছ থেকেই এইসব অশ্ব ও বস্ত্রাদি লাভ হয়েছিল] । পাণ্ডুতনয়েরা আমার পরম শত্রু। আমি তাহাদের কুবের সদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া যারপরনাই সন্তপ্ত হইয়াছি।

এরপর এই প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের যে উত্তর, সে সম্বন্ধে দেখা যায় - তাঁর পূর্বের কথাগুলোর মূলে ছিল - অতিলোভ, ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা ত্যাগ করে নিজেদের ধনৈশ্বর্যেই তৃপ্ত থেকে সুখে শান্তিতে বাসেরই উপদেশ। অন্যপক্ষে কিন্তু এখন দুর্যোধনের খেদোক্তি শোনার পরে, তাঁকে দিতে দেখা যায় অর্থার্থী হয়ে ধর্মাচরণ বা ধর্মপালনের নির্দেশ - 'বৎস! যদিন তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রীলাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে সচ্চরিত্র হও। সচ্চরিত্র দ্বারা ত্রিলোক আয়ত্ত

করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে সচ্চরিত্র সাধুব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, মান্ধাতা একরাত্রি মধ্যে, জন্মেজয় [পাণ্ডবদের বহু পূর্ববর্তী অন্য একজন প্রাচীন রাজা] তিন দিবসে এবং নাভাগ সাত রাত্রিতে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ভূপালেরা সচ্চরিত্র ও অতিশয় দয়ালু ছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা উহাদিগের গুণে বদ্ধ হইয়া স্বয়ং উহাদের আয়ত্তা হইয়াছিল।' কথাগুলো দ্বারা স্পষ্টতঃই এইসব রাজাদের অসাধারণ ঐশ্বর্য বা বলবীর্য অপেক্ষা, তাঁদের নিজ নিজ অধ্যাত্ম সম্পদ বা আত্মজয়ের ক্ষমতার দিকেই যে বেশী করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, একথা বোধ হয় বলাই নিষ্প্রয়োজন। [তুলনীয় - 'He is the greatest conqueror who can conquer himself]। এইভাবেই দেখা যায়, গীতা বা উপনিষদাদিতে যে আত্মজয়, নিষ্কাম কর্মযোগ প্রভৃতির শিক্ষা, মহাভারতে লোকশিক্ষার জন্য তাকেই প্রচার করা হয়েছে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে-হেঁয়ালী করে, কখনও স্বর্গলাভের কখনও বা মর্ত্যজয়ের প্রলোভন দেখিয়ে! মনে হয়, এইরূপ প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়েই – শ্রেয়র বদলে প্রেয়লাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই, এরপর প্রশ্ন করতে শোনা যায় দুষ্টমতি দুর্যোধনকেও সচ্চরিত্র লাভ সম্বন্ধে - 'মহারাজ! যাঁহার প্রভাবে ঐ সমস্ত মহীপাল অতি অল্পকাল মধ্যে বসুন্ধরা অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সচ্চরিত্রতা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে?' দুর্যোধনের এহেন প্রশ্নের আন্তরিকতা সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে যাই ভেবে থাকুন, ওর উত্তরে শুনিয়েছিলেন তিনি এবারে দুর্যোধনকে নারদের মুখে শোনা ইন্দ্র-প্রহ্লাদ-সংবাদ নামে বিচিত্র এই পুরাকাহিনীটি।

(৩)

অনেকদিন আগেকার কথা। দানবরাজ প্রহ্লাদ একবার নিজ চরিত্র বলে দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য দখল করে নিয়েছিলেন। কি আর করেন ইন্দ্র! দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বিনীতভাবে জানতে চাইলেন, কি করে তাঁর পক্ষে শ্রেয়োলাভ সম্ভব। বৃহস্পতি ছিলেন জ্ঞানী। মোক্ষলাভকেই তিনি চরম ও পরম পুরুষার্থ বলে জ্ঞান করতেন। কাজেই বললেন তিনি ইন্দ্রকে - 'দেবরাজ! মোক্ষোপযোগী জ্ঞানই শ্রেয়োলাভের নিদান। কিন্তু ইন্দ্র তো আর মোক্ষকামী ছিলেন না! তাই কথাটা তাঁর

ভাল না লাগবারই কথা! অগত্যা বললেন তিনি বৃহস্পতিকে - ‘ভগবন্! মোক্ষোপযোগী জ্ঞান ভিন্ন শ্রেয়োলাভের অন্য কোন আর উপায় যদি কিছু থাকে, তবে তা আমায় বলুন’। কিন্তু নিজে তিনি যাকে একমাত্র পথ বলেই মনে করেন, তাকে ছাড়া আর কিই বা বলতে পারেন বৃহস্পতি? কাজেই তাঁকে একরকম বাধ্য হয়েই বলতে হল ইন্দ্রকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে যেতে। বৃহস্পতির কথা মতো শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে শ্রদ্ধার সাথে তাঁর উপদেশ শুনে অনেকটা ভাল লাগল বটে ইন্দ্রের; কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবারও মনে প্রশ্ন জাগে – শ্রেয়োলাভের এ থেকেও আরো কোন উপায় আছে কী? আকার-ইঙ্গিতে তাঁর মনের ভাব বুঝে নিয়ে, বললেন শুক্র ইন্দ্রকে - ‘মহাত্মা প্রহ্লাদ এ বিষয়ে তোমাকে সবিশেষ জ্ঞানোপদেশ দিতে পারবেন। অতএব তুমি এখন তাঁরই কাছে যাও।’ বেশ কথা! কিন্তু যার জন্যই এতসব কাণ্ড, সেই অসুররাজ প্রহ্লাদের কাছে তো আর এভাবে যাওয়া চলে না ইন্দ্রের পক্ষে! কাজেই ইন্দ্রের বেশ ছেড়ে ধরতে হল এবারে দেবরাজকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ। হোক দেব পুরীই, ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্বত্রই অবাধ গতি! বোধ হয় এইজন্যই, অন্য আর কথা কী? স্বয়ং কৃষ্ণকেই দেখা যায় একদিন ভীমার্জুনকে নিয়েও ব্রাহ্মণের বেশেই, জরাসন্ধকে বধ করবার উদ্দেশ্যে তাঁর পুরীতে প্রবেশ করতে! কিন্তু একি বিড়ম্বনা! পাতালপুরীর রাজত্বের পরে, এবারে স্বর্গরাজ্য হাতে পেয়ে, ভক্তরাজ প্রহ্লাদের আজ আর অন্যকে উপদেশ দেবার মতো আদৌ কোন সময় নেই! তবে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তো নাছোড়বান্দা! ‘বেশ তো! যখন তোমার ফুরসত হবে তখন উপদেশ দিও, সেজন্য আমি যতদিন দরকার অপক্ষা করে বসে থাকব’ - মিনতির সুরে বললেন তিনি কথাগুলো দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে, ও তারপর তাঁর অনুমতি নিয়ে অনুগত শিষ্যের মতোই দিনের পর দিন ধরে করে যেতে লাগলেন তাঁর সেবা-শুশ্রূষা!

(৪)

দিন যায়। একদিন সময় বুঝে জিজ্ঞাসা করলেন ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদকে -

DO NOT COPY

'দৈত্যরাজ! কিরূপে তুমি এই ত্রৈলোক্যরাজ্য অধিকার করলে তা আমাকে একটু বলো!' ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তরে বললেন তাঁকে প্রহ্লাদ - 'ব্রাহ্মণ! রাজা হয়েছি বলে কদাচ আমি ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা করিনি। তাঁরা শুক্র প্রণীত নীতি বিষয়ক উপদেশ দান করলে, তা আমি পরম সমাদরে শ্রবণ ও সেই অনুসারে কাজ করে থাকি। কাজেই তারা খুশি হয়ে আমার কাছে যাবতীয় নীতিকথা কীর্তন করেন এবং আমাকে নীতিপরায়ণ, শুশ্রূষানিরত, ধর্মপরায়ণ, জিতক্রোধ জিতেন্দ্রিয় বোধ করে, মৌমাছি যেমন মৌচাকের মধ্যে একটু একটু করে মধু প্রবিষ্ট করাতে থাকে, তেমনি করেই আমার মনের মধ্যেও অল্প অল্প করে শাস্ত্রীয় উপদেশ দ্বারা জ্ঞানলোকের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণের মুখে নীতিকথা শ্রবণ ও সেই অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নেই!

এই প্রসঙ্গে শুক্রাচার্যের কথাতে বলতে হয়, প্রবাদ - কোন এক সময়ে বহুকাল যাবৎ মহাযোগী মহেশ্বরের শরীরের মধ্যে বাস করার পরে, তিনি তাঁর শিশ্নদ্বার দিয়ে নির্গত হয়েছিলেন বলেই 'শুক্র' নামে অভিহিত হন। মনে হয়, রেতঃ বা শুক্র ধারণেই যে সকল বলবীর্য বা মেধার কারণ এবং সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী শুক্রাচার্য স্বয়ংই যে এই শুক্রস্বরূপ, রূপকের ছলে শাস্ত্রকার ব্যাপারটিতে সেইরূপই ইঙ্গিত দিয়েছেন। এছাড়াও লক্ষণীয় - এই শুক্র বা বীর্যধারণে শক্তিলাভ হয়, রজোগুণবৃদ্ধি হয়, কার্যদক্ষতা বাড়ে বটে, কিন্তু সত্ত্বগুণের অভাবে ঐ শক্তি অনেকক্ষেত্রেই দানবীয় শক্তিতে পরিণত হয়। অপরপক্ষে, এরূপ ক্ষেত্রে যেখানে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য ঘটে, সেখানে হয়ে থাকে দৈবী শক্তির আবির্ভাব। এরপর এখানে ব্রাহ্মণ বলতেও, কেবল শাস্ত্রজ্ঞ নীতিপরায়ণ, ত্যাগব্রতী ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকেই বুঝতে হবে, যদিও পুরাণের যুগে, বিশেষ করে মহাভারতের কালে, সমাজে ব্রাহ্মণ বংশীয়দের প্রাধান্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকায়, ব্রাহ্মণের স্বাধিকার রক্ষা করতে এইভাবে যত্রতত্র ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য কীর্তিত হতে শোনা যায়।

(৫)

যাহোক, ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রের সেবা ও কথাবার্তায় খুশী হয়ে, বললেন একদিন

তাঁকে প্রহ্লাদ তাঁর কাছ থেকে মনোমত বর চেয়ে নিতে। বলাবাহুল্য, এই সুযোগেরই অপেক্ষায় এতদিন ধরে বসে ছিলেন ব্রাহ্মণটিও। এবারে সময় বুঝে, যে গুণে প্রহ্লাদ স্বয়ং স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন, সেই সচ্চরিত্রতাই চেয়ে বসলেন তিনি তাঁর কাছে। হঠাৎ এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রার্থনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রহ্লাদ হয়ে পড়লেন (মহাভারতের কথায়) 'যুগপৎ পরমপ্রীত ও নিতান্ত ভীত।' প্রীত কেন? না, প্রহ্লাদ তো কেবল দৈত্যরাজই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভক্তরাজও বটে! কাজেই কারও মনে সচ্চরিত্রতালাভের আকাঙ্ক্ষা জাগতে দেখে, তাঁর তো প্রীত হবারই কথা! আর ভীত? তার কারণ বোধ হয় এই যে সচ্চরিত্রতা হারালে একে একে তাঁকে সবকিছুই হারিয়ে ফেলতে হবে! বস্তুতঃ এর পরের যে ঘটনা তাতে এই আভাসই দিতে দেখা যায়।

(৬)

বর নিয়ে ব্রাহ্মণ তো উধাও। অন্যপক্ষে বর দিয়ে হয়ে পড়েছেন প্রহ্লাদ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এমন সময়, কী আশ্চর্য! হঠাৎ তাঁর দেহ থেকে নির্গত হ'তে দেখা গেল ছায়ার মত এক তেজঃপুঞ্জ। 'কে তুমি?' উত্তর এলো – 'আমি চরিত্র। এক্ষণে তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি। যে ব্রাহ্মণ শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্বক প্রতিনিয়ত তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, আমি অতঃপর তাঁহারই দেহে অবস্থান করিব।' এরপর দেখতে না দেখতে আর একটি তেজও প্রহ্লাদের শরীর থেকে বেরিয়ে এসে বলল তাঁকে - দৈত্যরাজ! আমি ধর্ম্ম, যে স্থানে চরিত্র, আমি তথায়ই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে চরিত্র সেই ব্রাহ্মণের সন্নিধানে গমন করিয়াছে, সুতরাং আমাকেও তথায় গমন করিতে হইবে।' ঠিক এই একই ভাবে আবারও একটি তেজকে বেরিয়ে আসতে দেখে, তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই বলল সেটি প্রহ্লাদকে - 'দানবরাজ! আমি সত্য, এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগপূর্বক ধর্মের সঙ্গে চলিলাম।' সত্যের প্রস্থানের পরে প্রহ্লাদের দেহ ছেড়ে বেরিয়ে এল এক মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ। 'কে আপনি মহাপুরুষ?' 'আমি সৎকার্য; যেখানে সত্য, আমি সেখানেই অবস্থান করি' - বলল সে বিস্মিত প্রহ্লাদকে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে।

DO NOT COPY

এরপর প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে বেরিয়ে এল আরও একটি তেজ। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল সে প্রহ্লাদকে - সে হচ্ছে বল, সৎকার্যের সাথেই তার সহাবস্থান। [অর্থাৎ কেবল সত্যনিষ্ঠ ও বলবানের পক্ষেই সৎকার্য করা সম্ভবপর; অন্যপক্ষে, সৎকার্য দ্বারাই সাধকের বলবৃদ্ধি হয়ে থাকে] । এবারে সকলের শেষে, প্রহ্লাদকে ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এক দিব্য নারীমূর্তি। 'আপনি কে?' উত্তরে বললেন তিনি প্রহ্লাদকে - 'দানবরাজ! আমি লক্ষ্মী। এতদিন আমি তোমার দেহে অবস্থান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমা কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া বলের অনুগমন করিব।' [কথায় আছে - বীরভোগ্যা বসুন্ধরা!] এখন প্রশ্ন-কই! প্রহ্লাদ তো কখনও লক্ষ্মীকে দান বা পরিত্যাগ করতে চাননি! তবে একথা কেন? স্বয়ং লক্ষ্মীর মুখ দিয়েই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এখানেই শাস্ত্রকারকে কাহিনীটি শেষ করতে দেখা যায়। প্রথমে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের আসল পরিচয়টা জানিয়ে দিয়ে, বললেন পরে লক্ষ্মী প্রহ্লাদকে -দানবরাজ! তুমি সচ্চরিত্রতা দ্বারা তিনলোক ও ধর্ম অধিকার করিয়াছিলে। দেবরাজ ইন্দ্র তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সত্য, সৎকার্য, বল ও আমি, আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন।' কথাক'টি বলেই, সচ্চরিত্রতা তথা ধর্ম্ম-সত্য-বল ও সৎকার্যহীন, প্রহ্লাদের দৃষ্টি থেকে লক্ষ্মীও অন্তর্হিতা হয়ে গেলেন। এখানে লক্ষ্মীর কথাগুলোর তাৎপর্য হিসেবে বলতে হয় -সচ্চরিত্রতা অর্থে সমষ্টিগতভাবে কায়মনোবাক্যে ধর্ম ও সত্যপালন, সৎকার্যসাধন, ও বলশালী হওয়াকেই বোঝায়, যার ফলে (মহাভারতের মতে) পরিণামে লক্ষ্মীলাভও অবশ্যম্ভাবী। [তুলনীয়-Virtue triumphs in the long run.] বিপরীতক্রমে আবার, সচ্চরিত্রতার অভাবে একে একে এ সকলকে ও অবশেষে লক্ষ্মীকেও হারাতে হয়! অবশ্য প্রকৃতপক্ষে ভক্তরাজ প্রহ্লাদকে কোন কালে সচ্চরিত্রহীন হয়ে ধর্মকর্মাদি ও শ্রীহীন হতে হয়েছিল কিনা, সে কথা স্বতন্ত্র।

(৭)

কাহিনীটির শেষে আবারও একবার শোনা যায় দুর্যোধনকে সচ্চরিত্রতা কি এবং কিভাবে তা লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রশ্ন করতে; এবং সংক্ষেপে

ও সোজা কথায় ধৃতরাষ্ট্রকেও তার উত্তর দিতে। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী!' - এটি যে কেবল তত্ত্বকথাই নয়, কার্যত অতি সত্য কথা, তার অনেক প্রমাণই পাওয়া যায় এরপরের মহাভারতের আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীতে!

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিঃ **স্বামী বিজ্ঞানানন্দ**

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্যবীজং পরমাসি মায়া।
সন্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।।
তুমি মা বৈষ্ণবীশক্তি মহাবীর্যবতী বিশ্ববীজ মহামায়া সন্মোহা ভবেব।
সুপ্রসন্না হলে হও তুমিগো জননী মোক্ষহেতুভূতা এই জগৎ জনের।
তখনো হয়নি সৃষ্টি এই পৃথিবীর চারিদিক পরিপূর্ণ কারণ বারিতে।

সেই কারণার্ণবেই অনন্ত শয্যায় শায়িত যোগনিদ্রায় বিষ্ণু ভগবান। সেইকালে কর্ণমূল হতে তাঁর জাত হলো মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয়।
তারা বিষ্ণুর নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে দেখে তাঁকে সংহার করার জন্য হল উদ্যত। ব্রহ্মা ভয়ে ভীত হয়ে বিষ্ণুকে জাগাবার জন্যে যোগনিদ্রারূপিনী মহামায়ার স্তব শুরু করলেন। তাঁর স্তবে মহামায়া তুষ্টা হয়ে বিষ্ণুকে ত্যাগ করলেন। তিনি জাগ্রত হয়ে দেখলেন অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে সংহার করার জন্য উদ্যত। তখন বিষ্ণু ভগবান অসুরদের নিহত করলেন নিজ জানুদেশে রেখে। সেই অসুরদের শরীরের মেদ দ্বারা এই মেদিনী (পৃথিবী) উৎপন্ন।

বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিনী এই দেবী হলেন তামসীমূর্তি মহাকালী। তারপর একসময় মহিষাসুর ত্রিলোক জয় করলে দেবগণ স্বর্গচ্যুত হন। দেবগণ একত্রিত হয়ে আলোচনা করলেন এবং তাঁদের তেজের সমবায়ে এক স্ত্রীমূর্তি উৎপন্ন হয়।

DO NOT COPY

দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্র দ্বারা তাঁকে অলঙ্কৃত করেন। ইহা রাজসীমূর্তি মহালক্ষ্মী। ইনি মহিষাসুর বধ করেন।

পুনরায় একদা শুম্ভ নিশুম্ভ দুই অসুর ভ্রাতার আবির্ভাব ঘটে। তারাও ত্রিলোক জয় করলে দেবগণ স্বর্গচ্যুত হন। তাঁরা এই অসুরদ্বয়কে সংহার করার জন্যে হিমালয়ে দেবীর তপস্যা করেন। দেবগণের তপস্যা ও স্তবে তুষ্টা হয়ে সাত্ত্বিকীমূর্তি মহাসরস্বতীরূপে আবির্ভূতা হয়ে শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করেন। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র রাবণ বধ হেতু এই মহিষমর্দিনী শ্রীদুর্গার অকালবোধন তথা পূজা করেছিলেন। এই হল পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত মহামায়া চণ্ডী সম্বন্ধিত কাহিনী। মেধস মুনি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে ইহাই বলেছিলেন।

(১) ঐতরেয়োপনীষদে ভূরাদিলোক সৃষ্টির পৃথক মতবাদ আছে। পরমাত্মার কামনা ও তপস্যাদ্বারা প্রথমে অন্তলোক, তারপর মরীচিলোক, তারপর মরলোক (ভূলোক) এবং তন্নিম্নে সাগর উৎপন্ন হয়।

প্রধানতঃ মহামায়া মহাশক্তির তিনটি মূর্তি তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী অর্থাৎ তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণ বিশিষ্টা শক্তি তথা প্রকৃতি - এই গুণত্রয় হতে অনন্ত শক্তি মূর্তি উৎপন্ন হয়।

দেবতা দানব মানব প্রজাপতি ব্রহ্মারই সন্তান। দেবতা ব্রহ্মবাদী পুরুষ ও প্রকৃতির মিলিত অবস্থাই ব্রহ্ম। তাই তারা উভয়েরই উপাসক। দানব দেহাত্মবাদী, তাই তারা এই দেহকে আত্মা মনে করে। লোভ ও ভোগের দাস ইহারা তমোমিশ্রিত রজোগুণী। আর মানুষ প্রথমে হয় দেহাত্মবাদী পরে ব্রহ্মবাদী হয়ে আত্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

অসুরগণ যখন তপশ্চর্যাদ্বারা প্রবল শক্তিধর হয় তখন দেবশক্তিও হার মানে। কিন্তু দেবতারা আবার তপস্যাদ্বারা মহাশক্তির আরাধনা করে শক্তিমান হয় তখন অসুর শক্তি নির্জিত হয়। পূর্বোক্ত কাহিনীত্রয় উহার প্রমাণ বহন করে।

DO NOT COPY

দৈবী সম্পদের অধিকারী দেবগণের কাছে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি তথা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী অভিন্ন। এই ব্রহ্মশক্তিকে তাঁরা পরমা প্রকৃতি পরমা জননী হৈমবতী উমারূপে জ্যোতির্ময়ীরূপে আরাধনা করেন। চণ্ডীতে তো বটেই শ্রুতিতেও দেবগণের স্তবস্তুতি থেকে জানা যায় জগতে যত প্রকার শক্তির খেলা চলছে তা সবই ব্রহ্মশক্তি দ্বারাই সম্ভাবিত হয়। তাঁদের স্তব থেকে জানা যায় পরমা জননী স্বাহা স্বধা বষট্‌কার নিত্যা শুদ্ধা জ্যোতির্ময়ী অর্দ্ধমাত্রা বাক্যতীতা। জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী সাবিত্রী গায়ত্রীরূপা নন্দিতা বন্দিতা ছন্দিতা শব্দিতা। সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারিণী মহামায়া মহারাত্রি মোহরাত্রি মহাবিদ্যা মাহেশ্বরী। তুষ্টি পুষ্টি শান্তি ক্ষান্তি লজ্জা ভ্রান্তি সরস্বতী লক্ষ্মী নারায়ণী।

তুমি মা স-কলা সকল বিদ্যারই আধার
সকল নারীর যা রূপ সে রূপ তোমার।
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপেই আছোই তুমি তো
কেবা পারে করতে বলো তব স্তুতি মাতঃ।।

তুমি তো মা ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মময়ী শিবশক্তি মাহেশ্বরী ব্রহ্মা শক্তি ব্রাহ্মী (ব্রহ্মাণী) ইন্দ্রশক্তি ইন্দ্রাণী বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী নারায়ণী। পুংলিঙ্গ সবই শিব স্বরূপ আর স্ত্রীলিঙ্গ সবই শিবানী স্বরূপিণী।

শিবপুরাণে উক্তঃ শঙ্করঃ পুরুষাঃ সর্বে স্ত্রীয়ঃ সর্বা মহেশ্বরী,
সর্বে স্ত্রীপুরুষাস্তস্মরোয়েব বিভূতয়ঃ।।

পুরুষ মাত্রেই শিব স্ত্রীলোক মাত্রেই শিবানী, জগতে স্ত্রী ও পুরুষ ভব ও ভবানীরই বিভূতি।

এই মহামায়া মহাবিদ্যা সকল জীব ও জগতের মোক্ষ আর মুক্তি হেতু ভূতা। আবার তিনিই ভ্রান্তি ও অবিদ্যা রূপিণী জগজ্জীবের বন্ধনের হেতু ভূতা। আবার

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্"

DO NOT COPY

সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া জগন্মূর্তি নিত্যাসর্বাধার। বস্তুতঃ এই যে জীব জগদ্রূপ পরিলক্ষিত হয় ইহা সেই পরমেশ্বরের শক্তি স্বরূপিণী পরমেশ্বরী রাজ রাজেশ্বরী ভুবনেশ্বরীর গর্ভ হতেই সম্ভূত। শ্রীভগবান গীতায় বললেন -

ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনাহনেন কৌন্তেয়ঃ জগদ্বিপরিবর্ততে।। (গীঃ ৯/১০)

অর্থ- প্রকৃতি সৃজন করে চরাচর মম অধিষ্ঠানে।
পুনঃ পুনঃ হে কৌন্তেয় বিশ্বসৃষ্টি হয় সে কারণে।।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উক্ত- যোষিতঃ প্রকৃতেবংশা পুমাংসঃ পুরুষ্য চ।
মায়য়া সৃষ্টিকালে চ তদ্বিনা ন ভবোদ্ভবঃ।।

স্ত্রী পুরুষে পরমেশ্বর অনুপ্রবিষ্ট হয়েই সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত; জগতে যোষিৎগণ প্রকৃতি এবং পুরুষগণ পরম পুরুষের অংশ। তা হলে জগন্মাতাই প্রকৃতি এবং জগৎ পিতাই পুরুষ। নির্গুণ পুরুষই প্রকৃতির সংসর্গে এসে সগুণ হয়। সৃষ্টি ব্যাপারে প্রকৃতির সহায়ই বলবত্তর। বস্তুতঃ শক্তি ও শক্তিমান ভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হলেও অভিন্ন এবং আধার বিনা আধেয় থাকেও না। প্রদীপে যে অগ্নি উত্তাপ বিচ্ছুরিত হয় উহার আধারতো প্রদীপ। তিলে তৈল থাকে, তিল বীজটি তিল তৈলের আধার বৈ তো নয়। স্বর্ণ ও তার বর্ণ অভিন্ন, উজ্জ্বলবর্ণ ও গুণ দ্বারা উহা চিহ্নিত হয়। জীবে জীবে যে শ্রুতিশক্তি দৃষ্টিশক্তি ঘ্রাণাদি শক্তির উন্মেষ হয়, মনঃশক্তি, বুদ্ধিশক্তি, চিন্তাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্ষুধা শক্তি, তৃষ্ণা শক্তি, কাম শক্তি, প্রেম শক্তি, আনন্দ-প্রজ্ঞান-বিজ্ঞান-অজ্ঞান-স্মৃতি-ধৃতি ইত্যাদি শক্তির উন্মেষ হয় এ সবই তো জীবের দেহগত ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুতন্ত্রীকে আশ্রয় করেই সাধিত হয়। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন কোন পদার্থকে প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত করলে তার থেকে বেরিয়ে আসে অণু পরমাণু (Atom & Proton)। এই পরমাণুকে আরো অধিক তাপে উত্তপ্ত করলে পাওয়া যায় নিউট্রন (Neutron)। ইহাকে আরো অধিক তাপে উত্তপ্ত করলে পাওয়া যায় (Plasma)। এই প্লাজমা হলো শক্তির আধার। পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছে উহাই অভঙ্গুর ব্রহ্ম পদার্থ বা ব্রহ্মশক্তি পদার্থ। কিন্তু দর্শন শাস্ত্রে বা তন্ত্র শাস্ত্রে শক্তিকে

DON'T COPY

বলা হয়েছে 'অনন্তবীর্যা' - অনন্ত শক্তি সমন্বিতা শক্তি তথা প্রকৃতি। বাস্তবিক পক্ষে দার্শনিকদের সংদৃকে সংজ্ঞানে ব্রহ্ম অণু হতে অণুতর, মহান হতে মহত্তর, অনন্ত, অগণনীয়। কাজেই তৎশক্তিও অনুরূপা বই তো নয়। বস্তুতঃ এই শক্তি নিরাধারা নহে। ইহা সর্বদা কিছুর সাপেক্ষে থাকে। যেমন বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চালিত হয়। এই যে সূর্যালোক বা চন্দ্রালোক বিচ্ছুরিত হয় উহাও নিরাধার নয়, উহাও অতি সূক্ষ্মতম পদার্থকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয় যেমন নদীর জলধারা জলস্রোত নির্গত হয়। এই যে আমাদের প্রাণ শক্তি তথা শ্বাস প্রশ্বাস শক্তির ক্রিয়া ইহাও নিরাধার নহে ইহাদের আশ্রয় ব্রহ্মতেজ। আত্মশক্তি তথা পরমাত্মাই সমস্ত কিছুর অনন্য আধার আশ্রয়। দৈহিক ইন্দ্রিয় শক্তি সমুদায় সম্পন্ন হয় ইন্দ্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে । এই দেহ ঘিরে বিশ্বভূবন জুড়ে এই যে তেজ বিদ্যমান আর সৃষ্টির আদিমাবস্থায় এই তেজরূপ কামনার বিন্যাস সেই তেজ মহাপাঞ্চভৌতিক পদার্থ বৈ তো নয়? শ্রীভগবান গীতায় বললেন-

ক্ষিতি-জল-তেজ-বায়ু-ব্যোম-বুদ্ধি-মন-অহঙ্কার।
এ অষ্ট পদার্থ হয় অপরাখ্য প্রকৃতি আমার।।
উহা ভিন্ন আছে মোর মহাবাহো? জেনো তাহা পরা।
জীব রূপা সে প্রকৃতি জেনো যাতে ধরা রয় ধরা।।(গীতা ৭/৪-৫)

প্রকৃতপক্ষে প্লাজমা শক্তির আপাতঃ সর্বোত্তম পর্যায় হলেও কোনও সর্বোত্তম আধারকে আশ্রয় করে তার গুণ ও ক্রিয়া প্রকাশ করে। যেমন বায়ুকে আশ্রয় করে গন্ধ ছড়ায়, আকাশাশ্রয়ে বায়ু থাকে তেমনি সকল পদার্থ আত্মায় আশ্রিত (গীতা ৯/৬) দ্রষ্টব্য। শিবরূপী শবের উপর কালী।

গীতায় ৯/৬ মন্ত্রে উক্ত- মোর দুই প্রকৃতিতে হয় জাত ভূত সমুদয়।
জগতের সৃষ্টি লয় সবি তাই আমাতেই হয়।
আরো ৯/৭ মন্ত্রে উক্ত- আমা হতে শ্রেষ্ঠ আর নাহি কিছু জেনো ধনঞ্জয়।
সূত্রে গাঁথা মণিসম আমাতেই বিশ্বধৃত রয়।।

আবার অথর্ববেদে উক্ত রয়েছে-

DO NOT COPY

সনত্মী সনমেব জাতৈষা পুরাণী পরিসংবভূব।

মহা দেব্যুষসো বিভাতী সৈকেনৈকেন মিষতা বিচষ্টে।।

অর্থাৎ- সনাতনী নিত্যা প্রকৃতি সর্বদাই প্রসিদ্ধা (সঞ্জাতা) যিনি পুরাতনী চির নবীনা চিরতরুণী অনাদ্যা। আবার ইনিই সর্বকার্যেই পরিপূর্ণরূপে বিরাজমানা। ইহা শ্রেষ্ঠ ও কান্তিময়ী জগতের সমুদায় কমনীয় পদার্থকে বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। এই প্রকৃতিই প্রত্যেক গতিশীল পদার্থের সহিত নিজের স্বরূপকে ঘোষণা করেন। পুনরায় জানা যায় খণ্ড মন্ত্রে-

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।

বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতি র্জাতমদিতির্জনিত্বম।।

অর্থাৎ - অদিতিই দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক, ভূলোক (সর্বলোক), ইনিই মাতা পিতা পুত্র, সর্বদেবতা পঞ্চজনা (পঞ্চলোক) এবং ইনিই জন্ম ও জন্মের কারণও। অদিতি হলেন আদ্যশক্তি যিনি অখণ্ডনীয়া অবন্ধনীয়া অসীমা। অনাদি পুরুষের আদি কামনাই এই শক্তিরূপে প্রথম প্রকাশিতা বৈ তো নয়। তাই বুঝি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন-

মমযোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।

মহদ্‌ব্রহ্ম মম যোনি গর্ভাধান করি আমি তাতে।

সকল ভূতের জন্ম হে ভারত! হয় তাহা হতে।।

যতেক দেখবে সৃষ্টি হে কৌন্তেয়! মহদ্‌ব্রহ্ম মাতা।

আমাকে জানবে সত্য সে সবের বীজপ্রদ পিতা। (গীঃ ১৪/৩-৪)

বাস্তবিক পক্ষে দৃষ্ট হয় পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ। পিতৃ শুক্র ও মাতৃ রজঃ সংযোগ ও সমবায়ে সন্তান উৎপন্ন হয়। ইহার বিস্তার ঘটে যথা পিতা হতে শুক্র মজ্জা অস্থি মাতা হতে রক্ত মাংস ত্বক দ্বারা পূর্ণাঙ্গ সন্তান-দেহ উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ যখন উৎপন্ন হয় তাহাতে পজেটিভ ও নেগেটিভ শক্তির মিলন দরকার হয়। তেমনি সন্তানের কাছে বা সৃষ্ট পদার্থ সমীপে পিতামাতা উভয়েই সমান। ইহাদের কাহাকেও ইতর

বিশেষ করা যায় না। কিন্তু মাতৃগর্ভে পিতা বীজাধান করেই ক্ষান্ত থাকেন আর জননী সেই বীজকে নিজগর্ভে প্রতিপালনাদি করতঃ যথাকালে প্রসব করেন সন্তান। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই দর্শন করে জননী ও জন্মভূমিকে। আবার কালে জননীই জনকের সহিত পরিচয় করিয়ে দেয় সন্তানের সহিত। জননী বিনা জনকের পরিচয় আর কে দিতে পারে? অনুরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী সম্পর্কেও ধারণা করা যায়। ব্রহ্মময়ীই একমাত্র বলতে পারে ব্রহ্মসন্তানকে ব্রহ্ম কে বা কি পদার্থ। আবার ব্রহ্মই (পিতা) বলতে পারে ব্রহ্মময়ী কি বা কে? তাইতো কেনোপনিষদে পরিলক্ষিত হয় উভয় তত্ত্বের দিগদর্শন। ব্রহ্মশক্তি স্ত্রীরূপিনী হৈমবতী উমা-ই দেবরাজ ইন্দ্রকে সর্বাগ্রে গুরুমাতা রূপে আকাশে আবির্ভূতা হয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন-এই যে যক্ষমূর্তি তোমরা দেখলে ইনিই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের বিজয়ে তোমরা হয়েছো মহিমান্বিত, “ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি” আর ইন্দ্রের উপস্থিতিতে ব্রহ্মান্তর্দ্ধানে বুঝিয়ে দিলেন এই হৈমবতী উমাই সব, এঁর থেকেই জানতে পারবে সব। ইহাতেই বুঝা যায় – ব্রহ্ম বলতে ব্রহ্ম ও শক্তি উভয়ই অভিন্ন। আদি গুরু জননী ব্রহ্মস্বরূপিনী সন্তানকে শিক্ষা দীক্ষা দেন। প্রাণী জগতেও এরূপ দৃষ্ট হয় বিড়াল কুকুর ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতি তাদের সন্তানদের শিক্ষাদান করে কোনটি খাদ্য কোনটি অখাদ্য, কি ভাবে শিকার ধরতে হয়, কোথায় তাদের খাদ্য পাওয়া যায়, বদহজম হলে কি খেতে হয় ইত্যাদি।

এই যে ‘উমা’ যিনি সর্বাগ্রে দেবরাজ ইন্দ্রকে শক্তিরূপে আবির্ভূতা হয়ে শিক্ষাদীক্ষা দিলেন তিনি তো কৈ বললেন না আমার শক্তিতে তোমরা জয়লাভ করে মহিমামণ্ডিত হয়েছো – পক্ষান্তরে ব্রহ্ম যক্ষমূর্তি হতে অন্তর্দ্ধান করে বুঝিয়ে দিলেন এই জ্যোতির্ময়ী মূর্তি উমাই তো সব, যা জানার এই শক্তির থেকেই অবগত হও। অর্থাৎ ব্রহ্মের বিজয় বলতে ব্রহ্মশক্তিরই জয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মের অব্যাকৃতাবস্থা থেকে ব্যাকৃতাবস্থা প্রাপ্তির মূলে ব্রহ্মেরই বিস্তার তথা ব্রহ্মশক্তিরই উন্মেষণা। জগতে যা এবং যত প্রকার শক্তি সম্প্রকাশিতা, জীবে জীবে লোকে লোকে অভিব্যক্ত, সে সবই ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মময়ীরই ক্রিয়া বিন্যাস। জীবের বাহুবল, জ্ঞানবল, দৃষ্টি, শ্রুতি শক্তি, প্রাণশক্তি (Vital Energy) সৎশক্তি, চিৎশক্তি (Divine Conscious Power

Energy) আনন্দশক্তি ইত্যাদি- গতিশক্তি গ্রহণশক্তি বিসর্জনশক্তি ইত্যাদি - পরিপাকশক্তি রক্তসঞ্চালন শক্তি স্নায়বীয় ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদি - জগতে যত প্রকার শারীরিক মানসিক বা আধিভৌতিক আধিদৈবিক আধ্যাত্মিক শক্তি বিন্যস্ত সে সব মহাশক্তিরই গুণ ক্রিয়া এবং মূলতঃ এই শক্তি শক্তিমানেরই। পূর্বোক্ত কেনোপনিষদের ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ডে চক্ষুরাদির ক্রিয়া বিষয় যা বর্ণিত হয়েছে তার থেকে জানা যায় কর্ণের কর্ণ, মনের মন, চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, বাক্যের বাক্য ইত্যাদি যার দ্বারা সাধিত হয় তাকেই ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা করো ব্রহ্ম বলে জেনো। যেন চক্ষুংষি পশ্যতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। তাই শক্তি তত্ত্ব ইহা ভিন্ন আর কি হতে পারে?

তা হলে হলো কিনা এই জগতে যত প্রকার শক্তির খেলা চলছে - সে সবই ব্রহ্মের আর সে সবই তাঁরই শক্তির বিন্যাসে সম্ভাবিত হয়। যখন তচ্ছক্তি তাঁতে একীভূত থাকে তখন এই সবই অব্যক্ত গর্ভে বিলীন হয়, আবার যখন সেই শক্তির ঘটে বিন্যাস তখন এই জগজ্জীব হয় পুনরায় ব্যাপৃত। যেমন মাকড়সা স্বেচ্ছায় স্বদেহ থেকে তন্ত সৃষ্টি করে তন্তজাল রচনা করে আবার প্রয়োজন বিধায় গুটিয়ে নেয় (মুঃ ১/১/৭, শ্বেঃ ৬/১০)। কাজেই শক্তি ব্রহ্ম হতে অতিরিক্ত কিছু নহে এবং শক্তি হতে ব্রহ্ম বিচ্ছিন্ন নহে। ব্রহ্ম পদার্থই জগজ্জীবরূপে প্রকাশিত হয় এবং সর্ব পদার্থেই নিগূঢ়ভাবে সংস্থিত। শ্রুতিতে উক্ত 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', গীতায় উক্ত 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' সর্বশ্রেষ্ঠ, মহানির্বাণ তন্ত্রে উক্ত 'সচ্চিদানন্দমেকং ব্রহ্ম', শ্রুতিতে উক্ত 'সতং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম', কাজেই সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। তিনি সর্বময় হলে তাঁর সৎ সত্তা, চিৎ সত্তা, জ্ঞানসত্তা, আনন্দ সত্তা সর্বত্রই বিন্যস্ত, ব্রহ্মের ব্রহ্মময়ী শক্তি এই সবকেই প্রকাশ করে। যেমন বটবীজে বিশাল বটবৃক্ষের সম্ভাবনা নিহিত থাকে, যেমন দুগ্ধে ঘৃতাদি পদার্থ নিহিত থাকে, তেমনি সর্ব পদার্থেই ব্রহ্ম ও তৎশক্তি বিদ্যমান। বস্তুতঃ মহামায়ার মহা-মোহশক্তি দ্বারা জীব মায়াচ্ছন্ন বলে পদে পদে বিভ্রান্তি ঘটে। যাদুকর মায়াপর্দার আড়ালে থেকে যাদুমন্ত্রের শক্তিতে যাদুমঞ্চে যাদু খেলা প্রদর্শন করে। দর্শক যাদুকরকে দেখতে পায় না, কেবল তার

DO NOT COPY

মঞ্চ ও খেলাই দর্শন করে। যাদুকর স্বেচ্ছায় বা প্রয়োজন বিধায় মায়াপর্দা সরিয়ে যখন দর্শকদের সামনে আবির্ভূত হয় তখন যাদু দর্শকগণ আনন্দে অভিভূত হয় এবং সবই উপলব্ধ হয়। তাই বুঝি মুন্ডক ৩/২/৩/৪ মন্ত্রে উক্ত "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" অর্থাৎ অনন্যচিত্ত সাধক যে পরমাত্মাকে স্মরণ করেন তিনি নিত্যযুক্ত যোগীর কাছে সহজ লভ্য।

ফলতঃ যদি কোন পুরুষ সাধন শক্তিতে ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হয়ে বলে যে আমিই জগতের কর্তা ও আমিই একমাত্র কিংবা যদি স্ত্রী সেই ব্রহ্ম স্বরূপতা অনুভব করে বলে যে জগতে একমাত্র আমিই আছি তাতে কিই বা ক্ষতি বৃদ্ধি? তাই মহামায়া শুম্ভকে বলতে পারেন "একেবাহং জগত্তত্র দ্বিতীয়া কা মমা পরা" (চণ্ডী ১০/৫)। উদ্দালক তৎ পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন 'তত্ত্বমসি'। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব জানতে হলে চাই তপস্যা ব্রহ্মচর্য ও উপাসনা। অন্যথায় কেবল তত্ত্ব নিয়ে মত্ত হলে অন্ধগর্তই খোঁড়া হয় যা জীবের পক্ষে মহা বিনষ্টির কারণ। কেননা কেনোপনিষদে উক্ত-

এই জীবনে পেলেই তাঁরে জীবন সফল তবে।
না যদি হায় পাই গো তাঁর মহান বিনাশ ভবে।।

ধ্যানতন্ময় হয়েই ইন্দ্র ব্রহ্মও ব্রহ্মশক্তি উমাকে জেনেছিলেন, আমরা তাই এখন সেই ধ্যানতন্ময় হই। এসো কম্বুকণ্ঠে সশ্রদ্ধ স্তব উচ্চারিত হোক-

জ্যোতির্ময়ী রূপে মাগো অনাহত হৃদয়ে আমার।
আবির্ভূতা হও দেবিঃ ভেদ করি অজ্ঞান আধার।।
বরাভয় প্রদায়িনী জননীর মূরতি নেহারি।
মন বুদ্ধি চিত্ত যাক শেষহীন আনন্দেতে ভরি।।
ওঁ শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্বস্যাতি হরে দেবি নারায়ণী নমোহস্তুতে।।
নারায়ণী নমোহস্তুতে। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ওম্।।

স্মৃতির সরণী বেয়ে-ভাইজাগ

শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য

১৯৮৮ সালের ৩০ জানুয়ারী যে ওয়ালটেয়ার, সীমাচলম আর আরাকুভ্যালি দেখতে বিশাখাপত্তনমে প্রথমবার নেমেছিলাম, গত তিন যুগে বারবার সেই ভাইজাগের ওপর দিয়ে গেলেও ২০২৪ এর এপ্রিলের আগে সেখানে আর যাওয়ার ইচ্ছে জাগেনি। এমন নয় যে আগে দেখা জায়গায় আমরা আর কখনও যাই না। দীঘা-পুরী-দার্জিলিং তো বটেই, রাজস্থান, সাউথ ইন্ডিয়া, উত্তরাখণ্ডও আমাদের বারবার তাদের কাছে টেনেছে। আসলে কোন লেখায় যেন পড়েছিলাম মামাবাড়ি ছাড়া বেশি নস্টালজিক জায়গায় আর না যাওয়াই ভালো, তাতে পুরনোকে না ফিরে পাওয়ার দুঃখই পেতে হয়। সেটা যে কত বড় সত্যি তা বুঝেছিলাম গত বছর লাদাখ থেকে ফেরার পথে মানালিতে দু'রাত্রি কাটাতে গিয়ে। এই মানালিতেই ২০০৩ এর মার্চে হোলির রঙে রঙ্গিন হয়েছিলাম স্থানীয় মেয়ে পুরুষদের সঙ্গে নাচের দলে ভিড়ে গিয়ে। দর্শক বলতে নাচিয়েরা ছাড়া তেমন কেউ ছিল বলে মনে পড়ে না। অথচ ২০২৩ এর ছবিটা একদম অন্যরকম। ভিড়ের ঠেলায় ম্যালে দাঁড়িয়ে থাকার পর্যন্ত উপায় নেই। যাক সে কথা, আসলে জীবনে যত জায়গায় গেছি তার মধ্যে ওয়ালটেয়ার তথা ভাইজাগের স্মৃতি এতটাই অন্যরকম যে সেখানে আর নতুন করে কোন দাগ কাটতে চাইনি। দী-পু-দা কে বাদ দিলে সেটাই ছিল বুবুনের সাথে আমার প্রথম ট্যুর। শুধু সে জন্য নয়, সেবার সঙ্গে ছিলেন আমাদের দু'জনেরই বাবা এবং মা। রামকৃষ্ণ বীচের ওপর শ'ওয়ালেসের যে গেস্টহাউসে আমরা ছিলাম তার তিনদিকে তিনটি ঘরই ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। কমন জায়গা যে লবি কাম ডাইনিং রুম, সেখানে তিনটি ঘর থেকেই দু'তিনটে সিড়ি ভেঙে নেমে আসা যেত। হেলপার সমেত এক বাবুর্চির কাজ ছিল চাইলেই মনের মত মেনু টেবিলে হাজির করা। সব সময়ের এক স্থানীয় কাজের মেয়ে, দারোয়ান আর গেটের বাইরে দু'দুটো অ্যাম্বাসাডার মিলে সে এক এলাহি ব্যবস্থা! যখনই মন চেয়েছে চলে গেছি অসাধারণ ঋষিকোন্ডা বীচে। কোনদিন সাবমেরিন মিউজিয়ম, লাইট হাউস অথবা ডলফিন নোজ দেখতে।

DO NOT COPY

একদিন চলে গেছিলাম ১৬ কিলোমিটার দূরের সীমাচলমে, যেখানে ৮০০ ফুট উচ্চতার কৈলাস পাহাড়ে রয়েছে ১৩ শতকের নৃসিংহদেবের মূর্তি। এমন কি অরণ্যচিরে পাহাড় ফুঁড়ে ৫৮ টানেল আর ৮৪ ব্রিজ পার হয়ে ১১৩কিলোমিটার রেলপথের শেষে যে আরাকু ভ্যালি, তাও দেখতে গেছিলাম ঐ অ্যাম্বাসাডারকে বাহন করে। এর ফলে ট্রেন যাত্রার মজা মিস করেছিলাম ঠিকই কিন্তু না হলে একদিনে বোরাকেভ সমেত আরাকুকে হয়তো দেখে নেওয়া সম্ভব হতো না। আসলে সেই সময় আমার বাবা ছিলেন ইন্ডিয়া-স্টীমশিপ কোম্পানীর ভাইস প্রেসিডেন্ট আর শ'ওয়ালেস ওদের স্থানীয় এজেন্ট। ফলে যেমন ইচ্ছে যাওয়ার সাথে মনের মত খাইবার পাসও আমাদের সঙ্গে ছিল। আজ যখন সাধ আর সাধ্যের মধ্যে একটা রফা করে এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়ি তখন সেই সব পাওয়া দেশটায় টুক্‌রো স্মৃতির ছবি খুঁজতে আর মন চাইতো না। তবু যে শেষ পর্যন্ত আবার বিশাখাপত্তনমে পা রাখলাম তার কারণ ছেলের কর্মস্থল হায়দ্রাবাদে বছরে একবার ঢুঁ মারা। আকাশে ওড়ার খরচ ক্রমশঃ যেভাবে লাফিয়ে বাড়ছে তাতে একটা দিকের যাত্রা রেলপথে হলে মানিব্যাগটা বেশ খুশি থাকে। এদিকে বয়স যতই বাড়ছে একদমে ২৬ ঘন্টা ট্রেনে কাটানো ততই কঠিন হয়ে পড়ছে - তা সে যতই আপার ক্লাসের টিকিট থাকুক না কেন। তাই এবছরের বাৎসরিক হায়দ্রাবাদে ঐ ভাইজাগ ছোঁয়া, জগন্নাথদেবের মন্দির বাদ দিলে পুরী পুরী গন্ধটা যে রামকৃষ্ণপুরমের বীচে দিব্য পাওয়া যায় এটা নিশ্চয়ই মানবেন। সেই সঙ্গে এপ্রিলের পাঁচটা দিন হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রামের মধ্যে ৩৬ বছর আগেকার স্মৃতি রোমন্থন – মন্দ কি!

২রা এপ্রিল হাওড়া থেকে ১২৮৩৯ চেন্নাই মেল ২৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম ছেড়েছিল ঠিক ২৩.৫৫-তে। চারজনের কূপে শুধু আমরা দুজন থাকায় আর পরদিন ১৩.৫০এ ভাইজাগ পর্যন্ত তৃতীয় কোন যাত্রী না আসায় যাত্রা ছিল দিব্য আরামের। স্টেশনের বাইরে থেকে রামকৃষ্ণপূরমের জমাটি বীচে পৌঁছাতে অটো ভাড়া নেয় ১০০টাকা। আমরা যেমন ঝাড়া হাত পায়ে ঘুরে বেড়াই তাতে সিটি বাসেও

DO NOT COPY

সমুদ্রপারের বাস-বে তে পৌঁছানো যেত। পুরীর মতই ঢেউ এর হুটোপুটির শেষে বালি আর ঝাঁ চকচকে রাস্তা পেরিয়ে উত্তর দক্ষিণে হোটেলের সারি। 'নভোটেল' অথবা পামবীচ হোটেল আমাদের পক্ষে একটু বেশিই ভালো তাই পাঁচ দিনের জন্য শেষ পর্যন্ত বেছে নিলাম 'সোনার বাংলা'র রুম নাম্বার ১০৩। সামনে বঙ্গোপসাগরের দাপাদাপি আর পাশে ভাত, ডাল, আলুপোস্ত, আলুভাজা আর মাছের বাঙ্গালী স্বাদ নেওয়ার সুযোগ! এছাড়াও হোটেলের সামান্য উত্তরে কালীবাড়ি আর পশ্চিমে রামকৃষ্ণ মিশন-সময় তো এমনিই কেটে যায়। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, বাইরে বেরিয়েও যারা বাঙ্গালী পরিবেশ খোঁজেন তাদের জন্য এই 'সোনার বাংলা' অথবা লাগোয়া 'নিরালা সৈকতে' একেবারে আইডিয়াল। শর্ত একটাই - সমুদ্রমুখী ঘর পেতে হবে। পাঁচদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি থাকার পক্ষে মোটামুটি হলেও বাঙ্গালী রসনার স্বাদ নিতে রামকৃষ্ণপূরমের তামাম বাঙ্গালী ভিড় করে এই দুই হোটেলের কোন একটায়।

পরদিন সাতসকালে সূর্য খুঁজতে রাস্তা পেরিয়ে বীচে গেলেও মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে আমাদের ফাঁকি দিল। একটু বেলা বাড়তে মেঘ বালিকাদের লজ্জায় লাল করে যখন সূর্যদেব পূব আকাশটাকেও রাঙিয়ে দিলেন, তাকে আর যাই হোক সান রাইজ বলা যাবে না। এবারে দেখলাম স্থানীয় লোকেরা বেশ স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠেছে। সামনের বীচ রোডে ওয়াকিং, জগিং, সাইক্লিং এমনকি স্কেটিং পর্যন্ত চলে সকাল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত। এই সময় গাড়ি চলাচল যাতে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ীদের ব্যাঘাত না ঘটায় তাই বাস বে থেকে উত্তরে যাওয়ার পথটাতে কলকাতা পুলিশের কায়দায় লোহার গেট বসিয়ে দেওয়া হয়। তফাৎ অবশ্যই আছে। ওখানে এমনটা করা হয় জনসাধারণের সুবিধার্থে আর এখানে? সেটা নাই বা লিখলাম।

সীমাচলম অথবা আরাকু ভ্যালি এবারের পরিকল্পনায় যে ছিল না সেটা আগেই বলেছি, এমনকি চেটেপুটে ভাইজাগের জন্য যে উদ্যোগের প্রয়োজন তাতেও যেন উৎসাহ ছিল না। তবে ১৩ কিলোমিটার দূরের ঋষিকোন্ডা বীচকে আমরা

উপেক্ষা করতে পারিনি। পূর্বঘাট পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে স্বর্ণাভ বালুতটের সৌন্দর্যের জন্যই শুধু নয়, নিরালা নির্জনে ঝাউবন, পাহাড় আর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বঙ্গোপসাগরের কাছে অতীতকে খোঁজারও একটা ব্যাপার ছিল। বাস-বে থেকে বাসে বাসে ও হয়তো ঋষিকোন্ডা আসা যায় কিন্তু সূর্য ওঠার বেলায় সেখানে পৌঁছাতে চেন্নারাও (৯৭০৪৯৬০৩২১) এর মত কোন অটোচালক দরকার যে কিনা ৬০০টাকার বিনিময়ে যাতায়াতের মাঝখানে ঘণ্টা দেড়েক সময় আপনাকে দেবে যাতে ঋষিকোন্ডার পার্কে গা এলিয়ে ঢেউ এর মাতামাতি দেখতে পারেন। পার্ক পেরিয়ে নৌবিহারের টিকিট কাউন্টার, কিন্তু সাত সকালে তার দরজা খোলেনি। একটু হাঁটলেই সিমেন্ট বাঁধানো পথটা হঠাৎপাথুরে হয়ে সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়েই দেখি সেদিনের প্রথম সূর্য – অভিযান সার্থক।

উত্তরের ঋষিকোন্ডা থেকে আরো উত্তরে ‘ভীমনিপতনম’। পূর্বঘাট থেকে গোস্থানী নদী এসে সাগরে মিশেছে এই ভিমানিপতনমেই। আমরা আবশ্য এবার সাগর সঙ্গমে যাইনি, পরিবর্তে বীচ রোড ধরে ৩০৪ মিটার উচ্চতার কৈলাসগিরি কে ডাইনে আর নতুন নতুন বীচকে বাঁয়ে রেখে ফিরে আসি ‘বাস-বে’ র ধারে যেখানে চায়ের দোকানগুলোয় ভিড় জমতে শুরু করেছে।

ভাইজাগে অবশ্য দর্শনীয় মধ্যে রয়েছে ৩৫৮ মিটার উঁচু পাহাড়ের লাইট হাউস আর শহরের দক্ষিণে বন্দর এলাকায় ডলফিন নোজ। ১৭৪ মিটার উঁচু ডলফিন নোজ পয়েন্ট থেকে প্রতিদিন ১৫-১৭টায় লাইট হাউসে চড়ার ব্যবস্থা আছে। ৬৪ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত জলযানকে নিশানা দেওয়া এই লাইট হাউসের উপর থেকে নীল সমুদ্রকে ছুঁতে চাওয়া শহরের দৃশ্য স্মৃতিতে স্থান করে নেয়।

প্রতিদিন সকালে মর্নিং ওয়াকের বাহানায় চলে আসতাম ‘ভুধা পার্কে’র কাছে ‘পামবীচ রেসর্ট’ পর্যন্ত। চলার পথেই দেখেছি খেজুর গাছে ঘেরা ভবিষ্যৎ রেসর্টের সম্ভাবনায় আরো একটি বীচ। ভুধা পার্কের প্রমোদ উদ্যানে এখন লেক হয়েছে। বোটিং-এর আনন্দ ছাড়াও রয়েছে গা ছমছম করা কৃত্রিম গুহা। উচ্ছল

DO NOT COPY

ঝরনার নাচের ছন্দ দেখতে পাবেন মিউজিক্যাল ফাউন্টেনে। আর অবশ্যই দেখবেন ফিশ অ্যাকোয়ারিয়াম। বীচ রোডের আরেক দর্শনীয় বিশাখা মিউজিয়ম। ৩৫০ কেজি ওজনের জাপানী বোমা যদি বর্তমানের চিহ্ন হয় তবে তালপাতায় লেখা রামায়ণের অংশ নিশ্চয়ই অতীতে ত্রেতাযুগকে মনে করাবে। মিউজিয়মের ১ কিলোমিটার দক্ষিণে বৈচিত্রে ভরা রাশিয়া নির্মিত ডুবোজাহাজে রয়েছে সাবমেরিন মিউজিয়ম। সোমবার ছাড়া প্রতিদিন ১৪-২১টায় এখানে ভারতের প্রথম সাবমেরিন কুরসুরা'র (১৯৬৭-৯৬) কলাকৌশল দেখা যায়। বিকেলটা চলে আসতাম দক্ষিণে অর্থাৎ ফিশিং হারবারের দিকে। চলার পথের মন্দির তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও এখানে বিশাল চক্রের ফটোজিনিক রূপ আপনার মোবাইলকে সক্রিয় করবেই।

এইভাবে কখনও বর্তমান কখনও স্মৃতির সরণী বেয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এক সন্ধ্যায় দেখি আমাদের ভাইজাগের মেয়াদ ফুরিয়েছে। পরদিন সকাল ঠিক ৫-৪৫-এ ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ২০৮৩৩ বন্দেভারত ছাড়বে সেকেন্দ্রাবাদে আমাদের পৌঁছে দেবে বলে। ঠিক সাড়ে আট ঘণ্টার জার্নি। ছেলের সাথে আবার দেখা হওয়ার আনন্দ আর তিনযুগ আগেকার স্মৃতির মধ্যে মন চালাচালি করতে করতে আগামীকালের এই পথ আমরা দিব্য পেরিয়ে যাব।

রামকৃষ্ণপুরম সৈকত

নিশ্চিন্ত নিদ্রা

DoNotCopy

কালী মন্দির

যাত্রার প্রস্তুতি

সান সেট

ভোরের সাগর

সান রাইজ

বাস বে

এ’ যুগের ছত্রপতি **সুনন্দন ঘোষ**

ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে আদিম হানাদারেরা।
তারকাঁটার ওপারে তাদের হিংস্র আস্ফালন।
গাছ আলোর দিকে যায়,
হায়েনা যায় রক্তের স্বাদ খুঁজতে।
স্ব-জন নেই, স্ব-ভূমি নেই,
কপট জিহাদীরা রক্তের লোলুপতায়
হাঁটছে বিবর্তনের উল্টোপথে।
দুধের শিশু, অসহায় নারী, প্রতিবাদী পুরুষ,
গলিতে বাড়িতে ফ্লাইওভারে ঝুলছে সারি সারি লাশ,
ধর্মের জিগিরে সৃষ্টি ভাঙে, কৃষ্টি ভাঙে, জ্বলে জন্মভূমি,
অন্ধ কারাগারে বিচারহীন গৈরিকের ভিড়,
স্বঘোষিত শাসকের আসন ভেসে যাচ্ছে স্বজাতির রক্তস্রোতে।

আফজল খাঁর আস্তিনে ছিল ছুরি, শিবাজীর হাতে বাঘ নখ।
হানাদারের পরাভবে ইতিহাসে লেখা হয়েছিল নতুন অধ্যায় –
‘হিন্দাভি স্বরাজ্য’।

আজ আবার আফজলদের হাতে ছুরি,
আর ধর্মহীনের ছদ্ম নিরপেক্ষতা নয়,
প্রতিটা মায়ের কোলে জন্ম নিক এযুগের ছত্রপতি।

DO NOT COPY